তারিখ ... 24 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

যুগান্তর

ড. শরীফ মজুমদার

সচিবের বেতন ও শিক্ষকের সম্মানী

বিতর্কটা অনেক দিনের; যদিও সম্মান-এ যৌক্তিকতায় বারবারই সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। এবার বোধহয় কিছুটা ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। বিতর্কটি চলুক, কারণ এতে করে অনেক গতানুগতিক মূল্যবোধ নতুন করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রথমত লক্ষণীয়, সামষ্টিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কার কেমন তা এবারের বিতর্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নয়, নিয়ামক হচ্ছে পে-স্কেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তুলনায় সচিবদের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তাতে কিছু চিন্তার খোরাক যে নেই তা নয়, তবে অধিকাংশই বাস্তবতার আলোকে যুক্তিহীন। একটি ছোট যুক্তি দিয়ে শুরু করি। যে কোনো মধ্যম বা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা হলে আনুপাতিক দৃষ্টিতে যে পেশাটি সবচেয়ে বিসদৃশ মনে হবে তা হল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। পত্রিকায় বহু লেখায় মধ্যম বা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে, আমি সেদিকে আর দৃষ্টিপাত করছি না। কিন্তু যে বিষয়টি মিডিয়ায় এখনও আসেনি তা হল বিভিন্ন দেশের আন্তঃপেশার তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার পর্যালোচনা। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে একজন সচিবের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কেমন আর একই পদের একজন বাংলাদেশী সচিবের সুযোগ-সুবিধা কেমন। এই তুলনামূলক চিত্রটি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংকার, সেনাকর্মকর্তা, বীমা পেশাসহ অন্যান্য পেশায় তুলে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'বেতনের' পরিবর্তে 'সম্মানীতে' সন্তুষ্ট থাকতে গিয়ে আজ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কোথায় নামিয়ে এনেছেন। কিন্তু এখন বোধহয় তারা 'বেতনের' কথা ভাবছেন, যেমন করে সচিবরা ভাবছেন। এখন বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আর 'সম্মানী' দিয়ে নিজের পরিবার, সমাজ কোথাও 'সম্মানিত' থাকতে পারছেন না। তাছাড়া অন্য যে বিষয়টি আমরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি তা হল, 'সম্মানী' দিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা হয় না। 'সম্মানী' অফিস কক্ষ, বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, চিন্তাশক্তি কোনোকিছুকেই বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। 'সম্মানী' দিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের একটি বা বড়জোর দুটি সন্তানের সম্মানজনক বা মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছেন না, ন্যূনতম বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারছেন না; সামাজিক অবস্থানের প্রতিযোগিতায় হীনমন্যতায় ভুগছেন; পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'সম্মানী' তাদের আর সম্মানিত করছে না; 'সম্মানী' দিয়ে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক হওয়ার পরও ঢাকার মতো যান্ত্রিক নগরীতে একটি গাড়ি মেইন্টেইন করতে পারছেন না, যেখানে 'সম্মানী' না নিয়ে 'বেতন' নেন বলে একজন সচিব এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত দেশেও একাধিক গাড়ির বিলাসিতা উপভোগ করতে পারছেন। সচিবরা যদি সততার বলে বলীয়ান হয়ে যুক্তিতর্কে আসেন তাহলে তাদের মেনে নিতে হবে, মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে ধরনের 'বেতন' পেয়ে থাকেন, এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মোটামুটি সে ধরনের একটি বেতন অনেক আগেই সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছিল এবং তা সচিবরাই অনেক কৌশলে 'সম্মানীর' দোহাই দিয়ে অন্ধকারের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন।

এবার অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এ বিতর্ক ভেতরে ভেতরে কম গড়ায়নি। সচিবদের এমনও বলতে শোনা গেছে যে, বিশ্বমানের মানদণ্ডে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার প্রভাব নেই বললেই চলে। এ মন্তব্যে পুরোটা না হলেও কিছুটা সত্যতা আছে। কিন্তু সে আংশিক সত্যের মূলে রয়েছে গতানুগতিক 'সম্মানীর' মনমানসিকতা ও 'সম্মানীর' সীমাবদ্ধতা, যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ প্রায়শই অনুধাবন করতে পারছেন। আমারই এক পরিচিত সচিব আমায় বলেছিলেন, তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছেন, যেসব আউটলেটে বিশ্বমানের গবেষণার সমাচার প্রকাশিত হয়, সেখানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তেমন কোনো গবেষণাকর্ম তার চোখে পড়েনি। হ্যাঁ, এর উত্তর, একদম নেই তা নয়, তবে খুবই কম। কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, Springer, Elsevier, World Scientific, Taylor & Francis, John Wiley— এই আউটলেটগুলোয় প্রকাশিত গবেষণাকর্মের ব্যয় সম্পর্কে তার কোনো ধারণা আছে কি-না? সরাসরি কোনো উত্তর মেলেনি; তবু আমি তাকে বলেছিলাম, এ ব্যর্থতার দায়ভারও 'সম্মানীর' ওপরই বর্তায়।

যা হোক, ওই যে বলেছিলাম, এ বিতর্ক থেকে শেখার আছে। একটি শিক্ষা হওয়া উচিত এমন— এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজকে সেই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, পদোন্নতি সবকিছুতেই ওই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের স্বচ্ছ প্রতিফলন থাকতে হবে। অন্যান্য উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশে একাডেমিক সেক্টরে পদোন্নতি ও নেতৃত্বের জন্য এ আউটলেটগুলোয় নির্দিষ্টসংখ্যক প্রকাশনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল কয়েক

> যে বিষয়টি মিডিয়ায় এখনও আসেনি তা হল বিভিন্ন দেশের আন্তঃপেশার তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার পর্যালোচনা। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে একজন সচিবের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কেমন আর একই পদের একজন বাংলাদেশী সচিবের সুযোগ-সুবিধা কেমন। এই তুলনামূলক চিত্রটি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংকার, সেনাকর্মকর্তা, বীমা পেশাসহ অন্যান্য পেশায় তুলে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'বেতনের' পরিবর্তে 'সম্মানীতে' সন্তুষ্ট থাকতে গিয়ে আজ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কোথায় নামিয়ে এনেছেন।

দশক আগে। এ বাধ্যবাধকতা তারা এতটাই গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োগ করেছেন এবং করছেন যে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি কারোই কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকছে না। আমাদের ক্ষেত্রে সে ধরনের কিছু না করতে পারাটাই হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ। সত্য বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের নীতিনির্ধারকরা যে ওই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সম্পর্কে জানতেন না তা নয়, জেনেও উপেক্ষা করতে হয়েছে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে।

তথাকথিত 'সম্মানীর' অসম্মান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজকে বেরিয়ে আসতে হবে। আজ সচিবরা বলছে, দুদিন পর অন্য সেক্টরের লোকজন বলবে। ব্যাংকাররা বলবে, আন্তর্জাতিক আউটলেটগুলোয় ব্যাংকিং সেক্টরের যে গবেষণা প্রকাশিত হয় তাতে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তেমন কোনো গবেষণাপত্র নেই। ইঞ্জিনিয়াররা বলবে; বীমা পেশার লোকজন বলবে; অর্থনীতি সেক্টরের পেশাজীবীরা বলবে; পরে সমাজ বলবে যে সমস্ত সমাজের সামনে অপেক্ষা করছে তা বড় নিষ্ঠুর। আজ শুধু ক্লিক করেই বিশ্বমানের পরিচিতি অর্জন প্রায় সবারই নাগালের মধ্যে। এ বিশ্বায়ন সমাজ সভ্যতাকে দুমড়ে মুচড়ে সময়ের দাবি অনুযায়ী খুব দ্রুত পুনর্গঠন করছে। এ পুনর্গঠনে শামিল হওয়া অনেক কষ্টসাধ্য, তবে শামিল না হওয়াটা পরবর্তী জেনারেশনের সঙ্গে নেহাতই প্রতারণা। সুতরাং সচিবদের মতো 'বেতন' চাওয়াটাও হয়তোবা সে পুনর্গঠনেরই অংশ। তবে সচিবদের সমালোচনায় কর্ণপাত করাটাও পুনর্গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'সম্মানী' বাদ দিয়ে 'বেতন' দাবির সঙ্গে যে চ্যালেঞ্জগুলো স্বাভাবিকভাবেই জড়িত তার কিছু আজ আলোচনার টেবিলে হাজির। সে চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না করে যদি 'বেতন' দাবি করা হয়, তবে তা 'সম্মানীতে' সন্তুষ্ট থেকে আজ যে অসম্মানের বেড়াজালে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ জড়িয়েছে তার চেয়েও বেশি অবমাননাকর হয়ে দাঁড়াবে। আরও বাস্তবভিত্তিক ভাবনার প্রয়োজন আছে। 'সম্মানী' যখন 'বেতন' হবে তখনও তা আন্তর্জাতিক আউটলেটগুলোয় প্রচুর কন্ট্রিবিউট করার মতো গবেষণায় ভাসিয়ে দেয়ার সুযোগ নিয়ে আসবে না; শুধু সিলেক্টিভ কিছু গবেষণা ওই আন্তর্জাতিক মানের আউটলেটগুলোয় প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ হিসেবে কাজ করবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মধ্যম আয়ের দেশে এ ক্ষেত্রে গবেষক ওই আন্তর্জাতিক আউটলেটগুলোয় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করার বিনিময়ে যে পরিমাণ আর্থিক ইনসেনটিভ পান, ঠিক একই পরিমাণ আর্থিক ইনসেনটিভ প্রদানের প্রথা চালু করতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, সেই আর্থিক ইনসেনটিভ দাবি করার মতো গবেষকের সংখ্যা এ দেশে প্রচুর নয়; কিন্তু ইনসেনটিভের প্রচলনটি না এলে ওই মানের গবেষক হয়তো একসময় একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা হোক, এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজকে 'সম্মানীর' অসম্মান থেকে বেরিয়ে এসে 'বেতনের' যৌক্তিকতায় নিঃসংকোচ হতে হবে।

অন্য যে বিষয়টি নিয়েও সচিবদের বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল তা হল, এত এত অধ্যাপকে ভরা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অথচ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আউটলেটগুলোয় গবেষণা অতি নগণ্য এবং বিশ্ব-র?্যাংকিংয়ে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান ক্রমপতনশীল। সত্যি বলতে কী, ক্রমপতনশীল র?্যাংকিং এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আউটলেটগুলোয় অপর্যাপ্ত গবেষণাপত্রের প্রকাশনা একই সুতায় গাঁথা। বাস্তব সত্য হল, আমরা যে সাবজেক্ট এরিয়ায় গবেষণার কথাই বলি না কেন, সে সাবজেক্ট এরিয়ায় সম্মানজনক ও প্রতিনিধিত্বকারী জার্নালগুলো সেই Springer, Elsevier, World Scientific, Taylor & Francis, John Wiley-এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আউটলেটগুলো থেকেই প্রকাশিত হয় এবং এই আউটলেটগুলোয় প্রকাশিত গবেষণার পরিমাণ বিশ্ব-র?্যাংকিংয়ে বিশ্বের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সত্যিই তো সারাজীবনে এ ধরনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আউটলেটগুলোয় একটি গবেষণাপত্রও প্রকাশ না করে নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দেয়াটা কিছুটা অন্তঃসারশূন্যতাই বটে; কারণ অধ্যাপক একটি আন্তর্জাতিক পদবী। তবে হ্যাঁ, এ আউটলেটগুলোয় গবেষণাপত্র প্রকাশ করা যে কতটা চ্যালেঞ্জিং, তা শুধু যারা সেগুলোতে প্রকাশ করেছেন তারাই জানেন। সুতরাং এ পাঁচটি আউটলেটের যে কোনোটিতে সীমিতসংখ্যক গবেষণাপত্র থাকার বাধ্যবাধকতা দিয়েও যদি অধ্যাপক পদটির মান রক্ষা করা হয়, তাহলেও অধ্যাপকের যে ব্যাপকতা এবং ক্রমপতনশীল র?্যাংকিংয়ের যে ধারাবাহিকতা, তার অনেকটুকুই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ড. শরীফ মজুমদার : *সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
sharifmath2000@yahoo.com